শিবনাথ শাস্ত্রী

বিদ্যাসাগর নাই

বিদ্যাসাগর নাই এ নিদারুণ বার্ত্তা আজ কেমন করিয়া লিখিব? বঙ্গের গৌরব সূর্য্য আকাশ হইতে খসিয়া পড়িল। চারিদিকে ঘন অন্ধকারে ঘিরিয়াছে, আর লিখিব কি? বঙ্গের যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল এ দুর্দ্দিনত আর যুগান্তেও কাটিবে না। দীন দরিদ্র আজ নিঃসম্বল হইল। চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবা আজ প্রকৃত অনাধা হইল। আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ কুলীন কুমারীগণ আজ অকুল সাগরে ভাসিল।

মরণই জগতের নিয়ম তাত জানি। মূর্খেরাই ... শোকের পারাবার উথলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখি বিদ্যাসাগরের মত কেহ নাই, আর কেহ যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তাইত শোকানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাসাগর কি সহজ মানুষ ছিলেন? তাঁহার মত লোক আর দেখিতেছি না, তাঁহার অদ্ভুত জীবনের কথা অনেকেই জানেন। আজ এই শোকের দিনে তাঁহারই কথা মনে হইতেছে, তাঁহার জীবনের কথাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাঁহার জীবনচরিত নয় সে যে পুণ্য চরিত।

১৭৪২ শকাব্দ, ইংরেজী ১৮২০ সনের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি হুগলী জেলায় অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিতেন। কলিকাতায় ১০ টাকা বেতনে একটি সামান্য কাজ করিতেন, বিদ্যাসাগর ৫ বৎসর বয়সের সময় গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। ৮ বৎসর বয়সের সময় কলিকাতা আসিয়া সহরের পাঠশালায় পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ৩/৪ মাস পরে পীড়িত হইয়া বাটীতে ফিরিয়া যান। ১৮২৯ সনের ১লা জুন তারিখে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজে ভর্ত্তি হইয়াই শ্রেণীর প্রথম ছাত্র হইলেন। পিতার সামান্য আয় ছিল, তদ্বারা সমস্ত পরিবারের ব্যয় কুলাইতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই নিজের হাতে রাঁধিয়া একবেলার ভাত তিন বেলা খাইতেন। এত কষ্ট পাইতেন কিন্তু কখনও পরের গলগ্রহ হন নাই। দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই জীবন আরম্ভ হয়। পাঠ্যাবস্থায় ১৬ কি ১৭ বৎসর বয়সের সময় ইনি বিবাহ করেন। ইহার চার বৎসর পরে সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের ... ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন ... সিবিলিয়ানগণ দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। ১৮৪৬ সনে বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক পুস্তক সিবিলিয়ানদের জন্য প্রণয়ন করেন। ইহাই বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক। এই বৎসরই সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। বৎসরাধিক কাল এই কার্য্য করিয়া পদত্যাগ করেন। এই সময়ে বাঙ্গলার ইতিহাস বাহির হয়। ১৮৪৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। এই বৎসর জীবন চরিত ও পর বৎসর বোধোদয় প্রকাশিত হয়, ১৮৬০ সনের ডিসেম্বর মাসে ৯০ টাকা বেতনে তাহাকে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত

করা হয়। বিদ্যাসাগর এই পদ প্রাপ্তির সময় বলিয়াছিলেন, "আমা অপেক্ষা অনেক সুযোগ্য লোক এই কলেজে আছেন। তাঁহারা থাকিতে আমি এই পদগ্রহণ করিতে পারিব না।" অনেক পীড়াপীড়ির পর বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার এক মাস পরেই অর্থাৎ ১৮৫১ সনের জানুয়ারী মাসে ১৫০ টাকা বেতনে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন। প্রিন্সিপাল হইয়াই সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন। দুরূহ সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিবর্তে স্ব-প্রণীত উপক্রমণিকা পড়াইতে লাগিলেন। ১৮৫২ সনে ব্যাকরণ কৌমুদির প্রথম ভাগ এবং পর বৎসর ২য় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। এই সময়েই ঋজুপাঠ সংগৃহীত হয়। ১৮৫৪ সনে শকুন্তলা-র বাঙ্গলা অনুবাদ মুদ্রিত করেন।

১৮৫৪ সনে হিন্দু সমাজে মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়। এই সময়ে তাঁহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ হইবামাত্র মহা ঝটিকা উপস্থিত হয়। সমস্ত সমাজ কাঁপিয়া উঠে। চারিদিকে নিন্দা প্রচারিত হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর ভয় পাইবার লোক ছিলেন না। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে যে সমস্ত পুস্তক বাহির হইয়াছিল ১৮৫৫ সনে অকাট্য যুক্তি বলে তাহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রার্থনায় ১৮৫৬ সনের জুলাই মাসে বিধবা বিবাহ বিষয়ক ১৫ আইন জারী হয়। ১৮৫৬ সনের ৭ই ডিসেম্বর, ২৭এ অগ্রহায়ণ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করেন। এই সময় হইতে বিদ্যাসাগর সমাজচ্যুত হন। ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি বিধবা বিবাহ হয়। এই সকল বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করিতে বিদ্যাসাগরের প্রায় ৮০ হাজার টাকা ঋণ হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের সাহায্যার্থ অর্থ পাঠাইতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া দিলেন— "যাঁহারা আমাকে বিপন্ন মনে করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের দান আমি গ্রহণ করিব না। বিধবাবিবাহের সাহায্যের জন্য যাঁহারা এক পয়সা দিবেন তাঁহা সাদরে গ্রহণ করিব।" বিদ্যাসাগর অবশেষে নিজেই সমস্ত ঋণ শোধ করিয়াছেন।

১৮৫৫ সনে তিনি বর্ধমান, হুগলী মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইনি সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনশত ও ইনস্পেক্টরের জন্য দুইশত টাকা বেতন পাইতেন। ইহারাই যত্নে ৫০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ইহার প্রণালী মতে সার্কেল স্কুল সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ সনে বালকদের জন্য বর্ণপরিচয় ও কথামালা লেখেন। পর বৎসরই চরিতাবলী মুদ্রিত হয়। ১৮৫৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় হইতে ইনি তাহার সভ্য ছিলেন, ১৮৫৮ সনের শেষ ভাগে কার্য্য ত্যাগ করেন।

যখন ইনি কার্য্য ত্যাগ করেন, তখন ইয়ংসাহেব শিক্ষা বিভাগের কর্তা ছিলেন। বিদ্যাসাগর স্কুল পরিদর্শনের রিপোর্ট ইয়ং সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ইয়ং বিদ্যাসাগরকে তাহার একস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বলেন। বিদ্যাসাগর অস্বীকার করেন। ইয়ং ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন "তোমায় পরিবর্তন করিতেই হইবে।" বিদ্যাসাগর কোন কথা বলিলেন না। ডান হস্তে এক টুকরো কাগজ লইয়া পদত্যাগ লিখিয়া ইয়ং-এর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "কেমন এখন খুশী হইয়াছেন।" বিদ্যাসাগর বহু অনুরোধেও আর পদ গ্রহণ করিলেন না। অনেকে বলিতে লাগিলেন "কাজ ছাড়িয়া খাবে কি?" তিনি বলিলেন "যে দিন দেখিয়াছি আমার ভৃত্য আমার জন্য এক পোয়া চাউল ধুইতেছে সেই দিন হইতেই জানি আহারের ভাবনা নাই।" বস্তুত চারিটি ভাত ও একটু লবণ হইলেই বিদ্যাসাগরের উদর তৃপ্ত হইত।

কার্য্যত্যাগের পর মহাভারতের উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী চতুর্থ ভাগ, আখ্যান মঞ্জুরী, মেঘদূতের মূল ও টীকা, ভ্রান্তিবিলাস, উত্তর চরিত, শকুন্তলার মূল ও টীকা প্রকাশ করেন। পুস্তক বিক্রয় হইতে এই সময়ে তাঁহার প্রতি মাসে ৫/৬ হাজার টাকা আয় হইল।

১৮৭১ সনে সমাজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কুলীন কন্যার দুঃখে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। কৌলিন্য প্রথা ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু গভর্নমেন্টের সাহায্যাভাবে এই প্রথা উৎসন্ন করিতে পারিলেন না।

বিদ্যাসাগর জন্মস্থান বীরসিংহে একটি এন্ট্রান্স বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় নিজ ব্যয় চালাইতেন। গ্রামস্থ দীন দুঃখীদিগকে মাসে ৫০ টাকা বৃত্তি দিতেন।

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন। তিনি মাসে ১৫ শত টাকা নিয়মিত রূপে দান করিতেন। তাঁহার আয় বৎসরে ৪০ হাজার টাকার বেশী ছিল না। কিন্তু তাঁহার অর্দ্ধেক গরিবের ক্লেশ বিমোচনে ব্যয় হইত। মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন বিদ্যাসাগরের মহাকীর্ত্তি। এই বিদ্যালয়ের নাম পূর্ব্বে ট্রেনিং স্কুল ছিল। ১৮৫৯ সনে সংস্থাপকদের অনুরোধে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য হন। পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে অন্যান্য সভ্যগণ কার্য্য ত্যাগ করিলেন। বিদ্যালয়ের সমস্ত ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর পড়ে। সেই সময় হইতেই নাম পরিবর্ত্তিত হয়। এই বিদ্যালয় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিদ্যাসাগরের যত্নে হিন্দু এনুইটি ফণ্ড স্থাপিত হয়। ইঁহারই যত্নে সোমপ্রকাশ সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সোমপ্রকাশ-এর উৎপত্তি বিবরণ অতি অদ্ভুত। সংস্কৃত কলেজে সারদাপ্রসাদ নামক এক গরিব ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। সারদাপ্রসাদ বধির ছিলেন। তিনি লেখাপড়া শিখিলেন বটে। কিন্তু বধিরতা দোষে কাজকর্ম পাইলেন না। তাঁহার জীবিকার জন্য সংবাদপত্র বাহির করিতে কল্পনা করিলেন। ইতিমধ্যে সারদাপ্রসাদ বর্দ্ধমানের মহারাজার মহাভারত অনুবাদের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য সংবাদপত্র বাহির করিবার প্রয়োজন হইল না। কিন্তু ভাল সংবাদপত্রের প্রয়োজন বোধ করাতে তিনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি কয়েকজনকে ডাকিয়া একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতে বলিলেন। সেই সময় হইতে সোমপ্রকাশের জন্ম হইল।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এক সময়ে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বজনীন উদার ভাবে তিনি তদ্‌সত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নানা কারণে আর তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না বটে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রাণে যে ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, সারাজীবন সেভাব তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছে।

১৮৬৭ সনে গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি জ্ঞান শূন্য হন। তখন যকৃতে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহার আর প্রতিকার হইল না। এই যকৃতের বেদনায় চিরদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন, আহার নিতান্ত কমিয়া গিয়াছিল। সকালে একমুষ্ঠি চাউলের অন্ন, রাত্রিতে কখনও অনাহার কখনও বা মুড়ি ও খই খাইতেন। চিকিৎসকের পরামর্শনুসারে যকৃতের বেদনা উপশমের জন্য আফিং-এর আরক খাইতেন। ক্রমে দেখিতে পাইলেন মাত্রা না চড়াইলে বেদনা নিবারণ হয় না। শেষে মরফিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পরিমাণও ক্রমশ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। চন্দননগর

বাসকালে একজন ভদ্রলোক বলিলেন "কলুটোলার আবদুল লতিফ নামক হাকিম ঔষধ দ্বারা আফিং খাওয়া নিবারণ করিতে পারেন।" বিদ্যাসাগর এই জুলাই মাসের ১লা তারিখ হাকিমের ঔষধ খাইতে আরম্ভ করিলেন। শরীর ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িল। ... হাকিমকে ছাড়াইয়া এলোপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ হইল ... কোন উপকার হইল না। হোমিওপ্যাথি ও ইলেকট্রিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হইল। কিন্তু রোগ বাড়িয়া চলিল। কবিরাজ ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু আর চিকিৎসার সময় ছিল না। মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় ৩৬ ঘণ্টা পর জ্বর ছাড়িল। তখন নাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিল কিন্তু আবার জ্বর আসিল—মঙ্গলবারের নিশা কি ভয়ঙ্কর রজনীই গিয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতেই সেই দিব্য দেহের বিকার হইল—রাত্রে ২টা ২২ মিনিটের পর অমর আত্মা অমৃত উৎসে গমন করিল। প্রদীপ নিভিয়া গেল।

চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। রাত্রি চারিটার সময় মহাপুরুষের দেহ শ্মশানঘাটে নীত হইল। প্রভাতে কত লোক তাঁহার তত্ত্ব লইতে গিয়াছিল তাহারা দিশাহারা হইয়া শ্মশান ঘাটের দিকে পাগলের ন্যায় দৌড়িয়া গেল। যাইয়া দেখে চিতানলে দেহ ভস্মীভূত হইতেছে। অগ্নিরাশি লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া সে দেহ গ্রাস করিতেছে। সব পুড়িয়া গেল, আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। যে দু-একখানা অস্থি ছিল, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক অঞ্চলে বাঁধিয়া কেহ কেহ গৃহে আনিলেন, জগৎ বিদ্যাসাগর শূন্য হইল।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গল্প :

বিধবাবিবাহ :

রামমোহন রায়ের বিষয় শুনা যায় যে, তাঁহার বালক কালে তিনি তাঁহার কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোকের সহমরণ স্থলে উপস্থিত ছিলেন। সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া বালক রামমোহনের প্রাণে এমনি আঘাত লাগিয়াছিল। যে তিনি শ্মশানে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে দেহে যতদিন জীবন থাকিবে সেই নৃশংস প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিষয়েও সেই রূপ শুনা যায়। যে তাঁহার কোন আত্মীয়া বালিকা অল্প বয়সে বিধবা হওয়াতে তাঁহার স্বর্গীয়া জননী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বর তোদের পোড়াশাস্ত্রের কি কচি মেয়েদের পুনর্ব্বিবাহের কোন বিধি নাই।" শুনিতে পাওয়া যায়, সহৃদয়া মাতার এই কথাগুলি শুনিয়া বিদ্যাসাগরের দয়ালু হৃদয় শেল সম বিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে সময় এত সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। সুতরাং এক একটি বচন উদ্ধার করিতে তাঁহাকে রাশি রাশি হস্তলিখিত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পড়িতে হইয়াছে। সে সময়ে তিনি বাড়ীতে যাওয়া পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে প্রায় দিন রাত্রি থাকিতেন। এক একবার গিয়া আহার করিয়া আসিতেন। অনেক অনুসন্ধানের পর শাস্ত্রীয় বচন সকল যখন প্রাপ্ত হইলেন, তখন জননীর চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন—"মা শাস্ত্রের বচন পাইয়াছি এখন বিধবার বিবাহ দিতে হইবে। তুমি কি বল?' পুত্রবৎসল মাতা পুত্রকে উৎসাহ দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, ওমনি বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। এমন হুলস্থূল আমরা জ্ঞানে কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছি রামমোহন রায়ের সহমরণ নিবারণের সময় এইরূপ আন্দোলন হইয়াছিল।

গ্রামে গ্রামে, নগরে, পল্লীতে পথে ঘাটে, যেখানে দশজন নিষ্ঠবান হিন্দু জুটিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃপুরুষের পিণ্ডের বন্দোবস্ত না করিয়া তাঁহারা জলগ্রহণ করিতেন না। এই সময়কার একটি কৌতুকের গল্প আছে। এই হুলস্থূলের সময়ে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে এক দোকানে বসিয়া আছেন, রেলগাড়ীতে কলিকাতায় আসিবেন। এমন সময়ে এক দীর্ঘাকৃতি রুদ্রাক্ষাধারী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত, তিনিও গাড়ীতে যাইবেন। দু এক মিনিটের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত। সেই চর্চাতে দোকানদার, পথিক, ক্রেতা, পুরুষ, স্ত্রীলোক, সকলে নিমগ্ন বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। ঐ দীর্ঘাকৃতি ভট্টাচার্য মহাশয়ই সে সভার সভাপতি; সকলেই তাঁহার সুখের কথা আগ্রহের সহিত শুনিতেছে। তিনিও প্রথমে বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা নির্দেশ করিয়া অবশেষে বিদ্যাসাগরের কুৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। বললেন আমি সে পাষণ্ডকে জানি, সে অতি কদাচারী, ইংরেজের মতো কাপড় পড়ে, অখাদ্য আহার করে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন—বড় কৌতুকের অবসর উপস্থিত। আর কি ছাড়া যায়। তিনি বলিলেন—"মহাশয় আপনি কি বিদ্যাসাগরকে জানেন?" উত্তর—"জানি বৈকি ... কলিকাতায় বেটা পাষণ্ডকে রোজ দেখতে পাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।" বিদ্যাসাগর ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণটিকে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় বিচারে টানিয়া আনিয়া ফেলিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া অনেক অভিসম্পাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন হে বাপু তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?" বিদ্যাসাগর যখন নাম বলিলেন, তখন ব্রাহ্মণটী কিছু অপ্রস্তুত হইলেন।

প্রথম বিধবাবিবাহ যেদিন হইল, সেদিনের কথা কেহ ভুলিবে না। সুকিয়া ষ্ট্রীটে ঐ বিবাহ হইয়াছিল। সেদিন সহরের লোক আর ঘরে ছিল না। সব সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সহরে এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, বিদ্যাসাগরকে মারিয়া ফেলিবে। প্রত্যেক ১০/১৫ হাত অন্তরে পুলিশ প্রহরী দণ্ডায়মান। বিদ্যাসাগর জাঁকজমক করিয়া বর আনিতেছেন! প্রথম বিধবা বিবাহ হইয়া গেল, অমনি লোকের তর্জ্জন গর্জ্জন, সামাজিক অত্যাচার ও নির্য্যাতনে পরিণত হইল। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা প্রথমে বিদ্যাসাগরের দিকে মত দিয়াছিলেন ও বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা অনেকে বিদ্যাসাগরকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পিতা কিয়দ্দিবস পরে কাশীবাসী হইলেন। আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, দেশবাসিদিগ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া বিদ্যাসাগর মহারথীর ন্যায়। রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। কেবল তাঁহার জননী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সেই স্বর্গগতা দেবী সদৃশ রমণীর অনেক গুণের কথা শুনিয়াছি। এমন মা না হইলে এমন ছেলে জন্মায় না। যে সকল বিধবা বালিকা বিবাহিত হইয়া আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা তাহাদিগকে ক্রোড় পাতিয়া লইতেন। স্বীয় কন্যার ন্যায় আদর করিতেন। তিনি অতিশয় উদার প্রকৃতি ও দানশীল রমণী ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল প্রকার সদ্ অনুষ্ঠানে উৎসাহ দান করিতেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র কৃষ্ণনগরে সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পর ওয়েল উইশার এবং এডুকেশন গেজেটে এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিত হয়। বিধবা বিবাহ সমর্থন করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। তাঁহাকে অনেকবার

বধ করিবার উদ্যমও হইয়াছিল। এই জন্য পাইকপাড়ার রাজপরিবার তাঁহাকে চারজন পাইক দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে লইয়া বাহিরে বেড়াইতেন। অনেক বিধবাবিবাহ দিয়া নিজ ব্যয়ে পালন করিতেন। ইহাতে তাঁহার ৮০ হাজার টাকা ঋণ হয়। রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা লইতে স্বীকৃত হন নাই।

কলিকাতার শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ হয়। তখন অনেক বড় বড় লোক এ-বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহ স্থানে উপস্থিত থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। মজার বিষয় এই যে, কেহই উপস্থিত হন নাই। এই বিবাহের পূর্ব্বে তিনি স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ বলিলেন "দেখুন, আমি ভিতরে ভিতরে আছিই ত, সাহায্য করিব, বিবাহক্ষণে নাই বা গেলাম," এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালস্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।" এই বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব :

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘোর দারিদ্র্যের ভিতর হইতে নিজ পুরুষাকারের গুণে উঠিয়াছিলেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা এককালে দারিদ্র্যের কোলে প্রতিপালিত হইয়া সম্পদ সৌভাগ্যের মুখ দর্শন করে, তাঁহারা প্রায় আপনাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত গোপন করিতে ব্যগ্র হন। কিন্তু প্রকৃত মনস্বী লোকদিগের মধ্যে এ দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মনুষ্যত্ব ও মনস্বিতা ছিল। তিনি যখন তৎকালিক ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন ইয়ং সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, তখন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাঁহাকে ডাকাইয়া পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বলিলেন—"বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার তোমার মস্তকের উপরে। তোমার নিজের কত ব্যয়, তুমি কি রূপে চালাইবে। এত টাকার কর্ম্মটা হঠাৎ ছাড়িও না।" বিদ্যাসাগর বলিলেন—"আপনি মনে করেন কি? আমি এই কলিকাতা শহরে ৫ টাকায় আমার নিজের খরচ চালাইতে পারি; এমন দিন গিয়াছে যখন আমার জন্য ২ টাকা ব্যয় হইত না। আমি আপনাদের অনুগ্রহের অর্থ অপেক্ষা স্বাধীনতাকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করি।" এই বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিজের আয় বৃদ্ধি বিষয়ে মনোযোগী হইলেন, এবং অচিরকাল মধ্যে মাসিক ৪/৫ হাজার টাকা আয় করিয়া তবে নিরস্ত হইলেন।

বিদ্যাসাগরের সহৃদয়তা :

তিনি একদিকে তেজে যে রূপ সিংহের ন্যায় ছিলেন, হৃদয়ে রমণীর ন্যায় কোমল ছিলেন। এই প্রবন্ধ লেখকের প্রতি বাল্যকাল হইতে তাঁহার স্নেহ ছিল। লেখক কলিকাতায় চাঁপাতলাতে বাসা করিয়া থাকিতেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে আসিতেন। লেখকের বাসার সন্নিকটে কোন বাড়ীতে নাপিতের বিধবা বাস করিত। এই বিধবার একটি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা ছিল, সেও শৈশবে বিধবা। মেয়েটি দেখিতে নাপিতের মেয়ের মত ছিল না, দেখিলে ব্রাহ্মণ

কায়স্থের মেয়ের মত বোধ হইত। সেই বালিকাটী লেখকের বাসায় খেলা করিতে আসিত। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বেড়াইতে আসিয়াছেন, এমন সময় সেই বালিকাটিও উপস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "মেয়েটী কে হে? কৈ তোমাদের বাড়ীতে আগে দেখি নাই।" উত্তরে—"আজ্ঞে ওটী পাড়ার একটী নাপিতের মেয়ে।" বিদ্যাসাগর "বল কি, দেখিতে ও নাপিতের মেয়ে বোধ হয় না।" উত্তর "আজ্ঞে তা বটে, অনেকেই ওকে ব্রাহ্মণের মেয়ে ভাবে। কিন্তু ও নাপিতের মেয়ে, আর শুনিবেন ওটী বিধবা।" যেই এই কথা বলা, অমনি বিদ্যাসাগর গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং সেই প্রতিভাতে উজ্জ্বল গণ্ডোপরি দরদর করে অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। মেয়েটীকে নিকটে ডাকিলেন, কোলে বসাইয়া বারবার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন পালকী করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া টাকা কাপড় দিয়া বিদায় করিলেন। পরদিন আবার আসিয়া বলিলেন "মেয়েটীকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেও, আমি বেতন দিব।"

বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা :

এক একটি বিধবার বিবাহ হইত, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় গহনাপত্রে যৌতুক প্রভৃতিতে অনেকশত টাকা ব্যয় করিতেন। এইরূপে তাঁহার অনেক শত টাকা ঋণ দাঁড়াইয়াছিল। একবার তাঁহার অনুপস্থিত কালে এডুকেশন গেজেটের তদানীন্তন সম্পাদক স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয় এই বলিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে দেনা হইয়াছে, তাহা তাঁহার স্বদেশবাসীগণের শোধ করিয়া দেওয়া উচিত, এই প্রস্তাবে অনেকে উৎসাহিত হইয়া সে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যেই এই কথা শুনিলেন অমনি তাঁহার বন্ধুদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার ঋণ শুধিবার ভার তাঁহারই, সে বিষয়ে অপরের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তৎপরে সেই ঋণ বরাবর নিজেই শোধ করিয়া আসিয়াছেন পরমুখাপেক্ষিতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের তেজ এতটা ছিল যে, দেখিলে বোধ হইত এই একটা মানুষকে দাঁড়িপাল্লার একদিকে, আর তোমার মত দুলাক পাঁচলাক দিলেও বোধহয় তাঁহার দিকটা ঝুঁকিয়া পড়িত।

তাঁহাতে কাপুরুষত্ব ছিল না। তিনি যাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, মুখামুখি তাহার সঙ্গে একটা মিটাইতে ভালবাসিতেন। সাক্ষাতে প্রিয় ভাবা, অসাক্ষাতে গরল ইহা তিনি জানিতেন না। যাঁহার প্রতি অগ্নি উদ্‌গীরতা করিতেন তাহা তাহার সম্মুখেই করিতেন। একবার একজন নিন্দাবাদকারীর সহিত তাঁহার মুখোমুখি বিবাদ হয়। সেই বিবাদস্থলে এই প্রবন্ধ লেখক উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্বে একটু আঘাত দিবামাত্র যেন লৌহের সংঘর্ষণে চকমকির অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেইরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর হইতে অগ্নি ফুটিয়া বাহির হইল। তিনি দক্ষিণ পদখানি দেখাইয়া বলিলেন, ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যার নাকে এই চটি শুদ্ধ টক করিয়া লাথি মারিতে পারি না।" বাস্তবিক সত্যকথা, তাঁহার সেই চটিজুতাযুক্ত পা খানার যে মূল্য ছিল, ভারতবর্ষের সমুদায় রাজাগুলার মুকুট, শোভিত মস্তক বিক্রয় করিলেও সে মূল্য হয় না।

কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে একবার তিনি গাড়ীতে বসিয়া আছেন, কুলি মিলিতেছে না সেই ষ্টেশনে অনেক সাহেব নামিলেন তাঁহাদের কুলি যুটিল। তিনি বসিয়াই আছেন। এমন সময়

একজন সাহেব তাঁহার গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন, "আমাকে চিনিতে পারেন?" তিনি বলিলেন "না।" দুই তিন বার জিজ্ঞাসিত হইয়া একই উত্তর দিলেন। তখন সাহেব বলিলেন "চিনিতে পারেন না, আমি ইডেন।" তিনি বলিলেন, "তুমি আগে পাতলা ছিলে। এখন মোটা হইয়াছ, কি করিয়া চিনিব?" ষ্টেশন মাস্টার প্রভৃতি বঙ্গের ছোটলাট ইডেন সাহেবকে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার পর বরাবর তাঁহাকে সাতিশয় সম্মান করিত।

বিদ্যাসাগরের দয়া :

তাঁহার দানের বিষয় আর কি বলিব? তাহা সর্বজন বিদিত। আজ বিদ্যাসাগর চক্ষু মুদিয়াছেন, আর কত কুটীরে, কত দরিদ্রের ভগ্ন গৃহে, কত অনাথ অনাথার আলয়ে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিয়াছে। তবু দু একটা বলি। বর্দ্ধমানে যখন ম্যালেরিয়া জ্বরের ধূম, তখন আমরা কলিকাতাতে বসিয়া শুনিলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজব্যয়ে, ডাক্তার ও ঔষধ লইয়া সেখানে গিয়াছেন; এবং ডাক্তার ও ঔষধ ... হাড়ি, শুঁড়ি, জেলে, নানা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া চিকিৎসা করাইতেছেন। তিনি গাড়ীতে বসিয়াছেন, একটা মুসলমানের বালক হয়ত তাঁহার ক্রোড়ে রহিয়াছে। এই জাতিভেদ প্রপীড়িত দেশে এমন উদার বিশ্বজনীন প্রেম আর দেখি নাই।

একবার দুই মাদ্রাজ প্রদেশীয় যুবক খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার উদ্দেশে বোম্বাই নগরে আসে। সেখান হইতে খৃষ্টীয় পাদরিগণ তাহাদিগকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। তাহারা ভদ্র ঘরের সন্তান, পিতামাতার অবস্থা ভাল। কিন্তু তাহাদের বিধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্প দেখিয়া পিতামাতা অর্থ সাহায্য বন্ধ করেন। কলিকাতাতে তাঁহারা পাদরিদের প্রদত্ত অর্থে প্রতিপালিত হইত ও তাহাদের সঙ্গে থাকিত; তাঁহারা তখনও খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয় নাই, এই সময়ে একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী যুবকের মুখে ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়া তাহারা খৃষ্টীয়দিগের আশ্রয় ও অর্থ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদিগের সহিত থাকিবার জন্য আসে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ চিরদিন দরিদ্র, সেই দুই জনকে প্রতিপালন করে ও শিক্ষা দেয় এমন সাধ্য কাহারও ছিল না। এই দুই যুবকের অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। তারা শেষে নিরুপায় হইয়া একখাতা বাঁধিয়া কলিকাতার বড়লোক দিগের নিকট ভিক্ষা করিতে লাগিল। লেখকের যতদূর স্মরণ আছে, একদিন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের কমিটির অধিবেশনের দিনে উক্ত সভাগৃহে গিয়া কতিপয় নামজাদা লোকের সই করাইয়া আনিল। স্বাক্ষর হইল মাসিক ৭/৮ টাকা কিন্তু আদায় করিতে প্রাণান্ত, রায় বাহাদুর রাজাবাহাদুরদের বাড়ীতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া যায়, দ্বারবাণ যদি ছাড়িয়া দেয়, দেওয়ানজীর ফুরসত হয় না। এই রূপ করিয়া তাহাদের পড়াশুনা চুলায় গেল। কেবল খাতা বগলে করিয়া ধনী বাবুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, পরিশেষে এরূপ জীবনের ক্লেশ আর সহ্য না হওয়াতে অনন্যোপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গমন করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন চিৎপুরে থাকিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন তাঁহাদের সেই চাঁদার খাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ও তাহাদের দুরবস্থার কথা শুনিলেন, তখন বাবুদের প্রতি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের কত হইলে চলে? লেখকের যতদূর স্মরণ আছে, তাঁহারা মাসিক ১৪ টাকা বলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, তোমারা ভদ্র ঘরের ছেলে, এরূপ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইও না। মাসের প্রথমে ১৪টী করিয়া টাকা

এক ব্রাহ্মণ কুমার সতত তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার সেবা ও মল মূত্রাদি পরিষ্কার করিতেছে। ইহাতে তিনি এ বালকের প্রতি এত আকৃষ্ট হন যে উহার বরাবর পড়াশুনার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। যখন এ বালক বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ১০০ টাকার পুস্তক পুরস্কার দেন।

তাঁহার অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহে অনেক সময় একই কার্য্যে তিনজন লোক পূর্ণ বেতন পাইয়াছে। হয়ত দুইজন শিক্ষক পীড়িত হইয়া ছুটী লইয়াছে; গরীব কিম্বা বৃহৎ পরিবার বলিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ বেতন দিতেছেন, তদ্ভিন্ন আর একজন শিক্ষক কাজ করিতেছেন। একজন শিক্ষকের মুখে রক্ত উঠায় তিনি পূর্ণ বেতনে ছুটি দেন। পরে ছুটি থাকতেই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়া আসেন যে, তিনি একটী কেরাণীগিরি পাইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু তাঁহাকে বলিলেন "তোমার ভয় নাই, শিক্ষকের বেতন তুমি পাইতে থাকিবে।" আর একজন শিক্ষক পীড়াবিশেষ বশতঃ অধ্যাপনা কার্য্যে অক্ষম হওয়ায় তাঁহাকে শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের সহকারী সুপরিন্টেডেন্টের কাজ দেন, বলা বাহুল্য ঐ স্কুলে উক্তপদের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

পাইকপাড়ার রাজাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বড় সদ্ভাব ছিল। একদিন বিদ্যাসাগর রাজাবাটীর দোতলায় বসিয়া রাজার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। সদর দরজার কাছে এক ভিক্ষুক চিৎকার করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল। রাজার কর্ণে যে চীৎকার ভাল লাগিল না। তিনি দ্বারবানকে বলিলেন, "ভিখারী কেন চিৎকার করিতেছে?" দ্বারবান লাঠি লইয়া ভিক্ষুকের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিল। ভিক্ষুক কাঁদিতে কাঁদিতে দরজা ছাড়িয়া সদর রাস্তায় গেল; দ্বারবান তবু তাহাকে ছাড়ে না; তাহাকে রক্তাক্ত কলেবর করিয়া দ্বারবান ফিরিয়া আসিল। বিদ্যাসাগর দোতলা হইতে সব দেখিলেন। তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া দৌড়িয়া নীচে গেলেন। রাজা তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি বসিলেন না। যেখানে ভিক্ষুক রাস্তায় পড়িয়া কাঁদিতে ছিল একেবারে সেইখানে গেলেন। তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া গাত্র ধূলি মুছাইয়া দিলেন। তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বড়লোকের দরজায় ভিক্ষা চাহিলে কি হয় তাহা বুঝিলি; আজ হইতে প্রতিজ্ঞা কর, আর বড়লোকের বাড়ী ভিক্ষা করিতে যাইবে না।" যে বাড়ীতে গরিবের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা হয়, বিদ্যাসাগর সে বাড়ীতে পদার্পণ করা পাপ মনে করিতেন। যতদিন জীবিত ছিলেন আর রাজবাটীতে গমন করেন নাই।

একবার সাঁওতাল পরগণায় খুব ওলাউঠা হয়। বিদ্যাসাগর তখন কার্ম্মাটারায় বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন ওলাউঠা রোগগ্রস্ত সাঁওতালদের কুটীরে যাইয়া রাত্রি জাগিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। একদিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখেন একজন সাঁওতাল ওলাউঠা রোগে পীড়িত হইয়া রাস্তার পার্শ্বে পড়িয়া আছে আর তাহার ঘরে যাইবার শক্তি নাই। তাহার সর্ব্বাঙ্গ মূত্র পুরীষে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর তাহাকে অমনি কোলে করিয়া নিজের গৃহে আনিলেন। নিজের হস্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মলমুক্ত করিয়া তাহার সেবায় লাগিয়া গেলেন। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লোকে দয়ার সাগর বলিয়া থাকে।

বিদ্যাসাগরের চোখের জল :

কথাই আছে "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর"। এ-কথাটির এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। তাঁহার মত দয়ালু লোক অতি অল্পই জন্মিয়াছে। গরীব লোককে মাসিক সাহায্য করিতে তাঁহার ন্যূনাধিক ১৫শত

ও দুই জোড়া করিয়া কাপড় এ দুই যুবকের জন্য আসিত। এতদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগর তাঁহাদের আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে ঐ দুই যুবকের কোন বিপদ ঘটিলে, কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহার অনুমতি বিনা ৩০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন। সেই দুই যুবক কিছু দিন পরেই দেশে ফিরিয়া গেল। কিন্তু যে কয়মাস তাঁহারা কলিকাতায় ছিল, বোধহয় এ ভাবেই সাহায্য পাইয়া থাকিবে।

তাঁহার দয়ার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সহিত সাঁওতালদিগের ব্যবহারের কথা মনে হয়। তাঁহার প্রসাদে খার্ম্মাটারের নিকটবর্তী সাঁওতালগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্ন বস্ত্রের সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে। একবার তিনি তথাকার সাঁওতালদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভাত খাইতে দেন। তাঁহারা যেন অমৃত খাইতেছে এইরূপ ভাবে ভাত খাইতে খাইতে বলিল যে "বৎসরের মধ্যে আর একদিন ভাত জুটিয়াছিল।" সম্বৎসরে তাহার ভাং, কদু প্রভৃতি বন্য খাদ্যের বীজ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি সাঁওতাল একবার দিন মজুরী হিসাবে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তিনি বেলা হওয়াতে তাহাদিগকে 'জল পান' দিতে বলিলেন। তাঁহারা কোনমতে লইতে চায় না, পাছে? তাহাদের জলপানের দাম কাটা যায়। কিন্তু তিনি অনেক করিয়া বুঝাইলে পর তাহার জলপান লইল। কিন্তু সন্দেহটা রহিয়া গেল। কাজ শেষ হইলে তিনি তাঁহাদের রুক্ষ কেশে তৈল দিতে হুকুম দিলেন। এইবার সাঁওতালরা মনে করিল যে নিশ্চয়ই তাহাদের মজুরী কাটা যাইবে। কিন্তু তিনি অনেক বলায় মাথায় তেল দিল। পরিশেষে যখন এ সকল সত্ত্বেও তাহারা পূর্ণ বেতন পাইল, তখন তাহাদের দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু বইতে লাগিল। এমন লোক তাহারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাঁওতালদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি "আমার সাঁওতালরা" এইরূপ বলিতেন। তিনি প্রথম প্রথম খার্ম্মাটারে থাকিতে মাছ পাইতেন না। সাঁওতালদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিল, "মাছ কোন দিন পাই কোনদিন পাই না, ও কাজে ভাত জুটে না। কোনদিন আবার বেশী পাইলে কিনিবার লোক পাওয়া যায় না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই তাহাদিগকে বলিলেন যে, "যত মাছ পাও আমি সব লইব।" তদবধি যত মাছ হউক লইতেন এবং বেশ হইলে আবার তাহা সকলের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। সাঁওতালরাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। একবার তাহারা তাঁহাকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া গিয়া কেহ তাঁহাকে দুটী কলাই, কেহ একটা কুমড়া উপহার দিল। একজন সাঁওতাল একটি মুরগীর ছানা উপস্থিত করিল। তিনি পৈতা দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহা কি করিয়া লইব?" "তুই নিবি না" বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অমনি হাত পাতিয়া মুরগীর ছানাটি লইলেন। তিনি বলিতেন যে, তাঁহার সাঁওতালরা বড় লোকের চরিত্র বুঝিতে পারে। সরলস্বভাব অনেক পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শবর্ষীয়া সাঁওতাল বালিকা শিশুর মত তাঁহার গায়ে পড়িত। অন্য লোকের সঙ্গেও তদ্রূপ ব্যবহার করিতে যাইত। কিন্তু যদি কোন অসচ্চরিত্র কলিকাতার বাবু যাইতেন, তাহারা একবার নিকটে গিয়াই পলাইয়া যাইত। তাহাদের স্পর্শেই অপবিত্রতা লুকাইয়া আছে বলিয়া আর কাছে ঘেঁষিত না।

তাঁহার কোন অধীনস্থ কর্ম্মচারীর দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র কলিকাতায় থাকিত। তাঁহাদের একজনের ওলাউঠা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। এবং সর্ব্বদাই দেখিতেন কোন

টাকা ব্যয় হইত। তদ্ভিন্ন ৫০/৬০ জোড়া কাপড় বহু সংখ্যক থালা বাটী প্রভৃতি বিতরণ করিতেন। কোন বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসে নাই। এতদ্ভিন্ন এককালীন যে কত হাজার টাকা দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দরিদ্র ছাত্রগণ দূর দেশ হইতেও তাঁহার নিকট রাশি রাশি পুস্তক পাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত দুষ্ট লোকে যে মিথ্যা বিপদের ভাণ করিয়া টাকা লইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। তথাপি তিনি দান করিতে নিবৃত্ত হইতেন না। পরিশোধ করিব বলিয়া টাকা লইয়া অনেক লোক আর পরিশোধ করিত না। কিন্তু তাহারাই আবার টাকা চাহিলে টাকা পাইত। বন্ধুগণ এরূপ দানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন "তোমরা বুঝ, আমি কি আর বুঝি না; কিন্তু আমি দুঃখের কথা শুনিয়া না দিয়া থাকিতে পারি না।

কেহ রাস্তা দিয়া কাঁদিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষে জল আসিত। কোন দুঃখের কথা শুনিলে বা প্রত্যক্ষ করিলে চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত। কোথা ফ্রান্স, স্পেন সেই সব দেশের ইতিহাসের কোন নিষ্ঠুর প্রথা বা ঘটনার বিষয় পাঠ করিতে করিতে তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, যে যে প্রাণের সৌভাগ্য ক্রমে তথায় তাঁহার পদার্পণ হইয়াছিল তত্তৎ স্থানের গরীব দুঃখীগণ তাঁহার দয়ার পরিচয়স্বরূপ নানা প্রকার সাহায্য পাইয়াছে। যখন যে রেলওয়ে ষ্টেশনে তিনি গিয়াছেন তথাকার ষ্টেশনমাস্টারেরাও বাদ যান নাই। আজ কত ব্যক্তি সত্যসত্যই পিতৃমাতৃহীন হইল। তিনি তাঁহার নিজ ভৃত্যগণকে নিজ বাটীর নিকট খোলার ঘর ভাড়া লইয়া সপরিবারে থাকিতে বলিতেন। এবং তাঁহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রীতির প্রতি তাঁহার এতই দৃষ্টি ছিল।

কলিকাতার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি গোলদীঘির চতুর্দিকে অন্ন বস্ত্র দিয়া, লোকদিগকে নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া ছিলেন। তাঁহার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ সর্ব্বজন পরিচিত।

তাঁহার চক্ষে যে কতবার পরদুঃখের জল পড়িতে দেখিয়াছি তাহার স্মরণ হয় না। পরের দুঃখ স্বচক্ষে দেখা দূরে থাক, অপরের দয়া ও দানশীলতার কথা স্মরণ করিতে ও বলিতেও দুই চক্ষে জল পড়িত। দ্বারকানাথ ঠাকুরের দানশীলতার কথা বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। কোন দুর্ব্বৃত্ত লোক কোন দরিদ্রের প্রতি বা কোন অনাধা বিধবা রমণীর প্রতি অত্যাচার করিতেছে শুনিলে তিনি ক্রোধে এমন অধীর হইয়া পড়িতেন যে তখন আর কিছুতেই ক্ষোভ নিবারণ করিতে না পারিয়া বলিতেন—"নিশ্চয়ই জানিলাম এ দুনিয়ায় মালিক নাই। মালিক থাকিলে তিনি এত অত্যাচার সহ্য করেন?" উঃ! এই কয়টি কথাতে গভীর বেদনা প্রকাশ করিতেছে।

বিদ্যাসাগরের চিকিৎসাবিদ্যা :

বিদ্যাসাগরের গৃহে বহু সংখ্যক মূল্যবান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক আছে। কোন চিকিৎসকের গৃহে এত পুস্তক আছে কিনা সন্দেহ। চিকিৎসাবিদ্যাতেও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। একবার কোন কুলকামিনীর হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়। তিন মাস কাল সেই মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নাই। এই তিন মাসের মধ্যে তিনি জলবিন্দু গলাধঃ করিতে পারেন নাই। সাড়া শব্দ কিছুই ছিল না, কয়েকখানা হাড়ের উপর পাতলা চামড়া সাড় ছিল। তিনি মাসের পর তাঁহার চেতনা হইল, ধীরে ধীরে শরীরে বল সঞ্চার হইল। কিন্তু পা দুখানিতে আর বল হইল না। এলোপেথি ও কবিরাজী মতে

বহু চিকিৎসা হইল, কিছুই কিন্তু হইল না। বরং আর নানা উপসর্গ উপস্থিত হইল। অবশেষে হঠাৎ বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বাড়ীতে আসেন। বিদ্যাসাগরের চিকিৎসায় তিনি সবল ও সুস্থ শরীরে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

সাঁওতালদের চিকিৎসা হইত না। বিনা চিকিৎসায় তারা মারা যাইত। বিদ্যাসাগর তাহাদের এ-দশা সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। সাঁওতালদের প্রতি দয়াই তাঁহাকে সুচিকিৎসক করিয়াছিল। তিনি কার্ম্মাটারে থাকিতেন। একদিন দুদিনের পথ হাঁটিয়া সাঁওতালেরা তাঁহার নিকট ঔষধ লইতে আসিত। একজন সাঁওতালের ঘা হইয়া পা খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। সলফার দিয়া তাঁহার ঘা দশদিনের মধ্যে আরোগ্য করেন। আরও ৩/৪ দিন ঔষধ দেওয়াতে ঘা আবার পূর্ব্বৎ হইল। বিদ্যাসাগর ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। একখানি পুস্তকে দেখলেন ৭/৮ দিনের পর সলফার দিলে রোগ আবার বাড়িয়া যায়। এই রূপে ঠেকিয়া, তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ দখল হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি :

তিনি যাহাকে ভালবাসিতেন, হৃদয় মন দিয়াই ভালবাসিতেন, আবার যখন চটিতেন, তাঁহার কোনও ভাব নরম হইত না। তাঁহার বর্ষীয়ান পরমারাধ্যা মাতার প্রতি যে ভক্তি ও ভালবাসা দেখিয়াছি তাঁহার তুলনা বোধহয় কোথাও দেখা যাইবে না। সচরাচর ব্রাহ্মণের সন্তান দশরাত্র অশৌচ পালন করিয়া শুদ্ধ হয়। বিদ্যাসাগর এক বৎসরেও মাতৃশোক ভুলিতে পারেন নাই। সেই এক বৎসর কাল, তিনি কাজ কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া চিৎপুরে বাস করিয়াছিলেন। যাহারা দেখা করিতে যাইতেন, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন তাঁহার জননীর বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হইতেন না। মায়ের নাম হইলেই তিনি মাতার গুণাবলী বর্ণনা করিতেন। আর বালকের ন্যায় আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন। হে শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক একবার এই মাতৃভক্তির বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন কর। যে শিক্ষাতে হৃদয়ের এই সরসতা নষ্ট করে, তাহা সমুদ্র জলে ডুবাইয়া দেও।

বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব :

অনেক বৎসর পূর্বে তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মিত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারেরা এরূপ মত প্রকাশ করেন যে যদি তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল সর্বাংশে রাখিতে পারা না যায়। তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রমাগত তিন বৎসর কাল তাঁহার চিত্ত বিনোদন করেন। এইরূপে কালীকৃষ্ণ মিত্রের জীবন রক্ষিত হয়। বাস্তবিক তিনি এমন গল্প করিতে পারিতেন যে লোকে বলিত যে, তিনি যদি আর কিছু না করিয়া বড় লোকের বাড়ীতে গল্প বলিয়া বেড়াইতেন, তাহা হইলেও মাসে মাসে ২ হাজার টাকা রোজকার করিতে পারিতেন। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয়া কোন পুত্রবতী মহিলা বহু বৎসর পূর্ব্বে উন্মাদ রোগগ্রস্থ হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তিনি পাগল হওয়ায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন অপর কেহ তাঁহাকে খাওয়াতে পারিত না। এই জন্য ক্রমাগত ছয় মাস ধরিয়া, তিনি পাল্কী করিয়া ঠিক সময় আসিয়া তাঁহাকে শিশুর মত মুখে গ্রাস তুলিয়া ভোজন করাইয়া যাইতেন।

বিদ্যাসাগরের ভালবাসা :

একটা বড় উকীলের যে আয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভা ও শ্রমের গুণে সেই উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু হৃদয়টি চিরদিন দীনদরিদ্রের মতই ছিল। বড় বড় বাবুদের বড় বাড়ী, বড় গাড়ী, বড় যুড়ী তাঁহার ভাল লাগিত না। গরীব দুঃখীর সঙ্গে মিশিতে ও তাহাদের পর্ণ কুটীরে যাইতে ভালবাসিতেন। মিস মেরী কার্পেন্টার যখন এদেশে আসেন তখন তিনি বালি উত্তরপাড়ার লাইব্রেরী, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি দেখিতে যাইতে যাইতে গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার যকৃতের এমনি দোষ জন্মিয়া যায় যে, তদবধি আর পূর্ব্বকার বল ও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শরীর সর্বদাই অসুস্থ থাকিত। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্ড লাইনে কার্ম্মাটার নামক স্থানে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শরীর মন একটু খারাপ হইলেই সেখানে গিয়া বাস করতেন। তিনি কার্ম্মাটারে আসিতেছেন শুনিলে, সেখানকার রেলওয়ের বাঙ্গালি বাবুরা আনন্দে নৃত্য করিতেন। কারণ তিনি সেখানে গেলেই পুত্র বাৎসল্যের সহিত সকলকে দেখিতেন। আজ মাছটা, কাল ভাল আঁব পরশু ভাল সন্দেশ এইরূপ সর্ব্বদাই স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ কত উপঢৌকন দিতেন। কিন্তু সর্ব্বদাই অধিক আনন্দ পাইতেন দরিদ্র সাঁওতালদিগের হইতে, তাহারা তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিত। তাঁহাদের বড় বড় ছেলে মেয়েরা তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে পয়সা কাড়িয়া লইত। তিনি তাহাতে বড় আনন্দ পাইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে ভালবাসিতেন তাহাকে খাওয়াইতে ও উপঢৌকন দিতে বড় ভালবাসিতেন। অকৃত্রিম প্রেমের এমনি স্বভাব, যে জিনিস দিতে হইবে, তাহা নিজে কিনিয়া না দিলে মন সন্তুষ্ট হইত না। মৃত্যুর একমাস কি দেড়মাস পূর্ব্বে চন্দননগর হইতে আসিয়া, নিজে পাল্কী করিয়া রাস্তাতে আম কিনিয়া আনিয়া বাবুদিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের ন্যায়নিষ্ঠা :

বিদ্যাসাগর যখন স্কুল ইনস্পেক্টার ছিলেন, সেই সময়কার কিছু টাকা তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল। ভ্রম ক্রমে সে টাকা গভর্ণমেন্টকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। একাউন্টেন্ট জেনারেলকে সেই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন গভর্ণমেন্টের হিসাব পত্রে টাকার কথা উল্লেখ নাই। বিদ্যাসাগর তথাপি সুদে আসলে হিসাব করিয়া সেই টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

কর্তব্য কর্ম্মের ন্যায়পরায়ণতা :

তিনি যখন গভর্ণমেন্টের ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের প্রাচ্য সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন তখন অনেক বড় বড় সাহেব নিজের সম্পর্কীয় লোকের জন্য সুপারিশ করিতে আসিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও এক নম্বরও বেশী দিতেন না। অধর্ম ও সাক্ষীদের প্রতি অত্যাচার হয় বলিয়া তিনি হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসের প্রদত্ত ওকালতীর সনন্দ গ্রহণ করেন নাই।

বিদ্যাসাগরের কর্ম্মিষ্ঠতা :

বিদ্যাসাগর কখনও দিনে ঘুমাইতেন না। তিনি এমন অনলস ছিলেন যে চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতেন, হেলান দিতেন না। বড় অধিক দিন নয়, তাঁহাকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সংস্কৃত হস্ত লিখিত পুঁথি পড়িতে দেখা গিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের নিরহঙ্কার :

বিদ্যাসাগরের অহঙ্কার ছিল না। পরিচ্ছদের অহঙ্কার কোন দিনই করিতেন না। চটি জুতা পায়, একখানা লং ক্লথের মোটা চাদর গায়, থানের মোটা ধুতি পড়িয়া তিনি যথা তথা হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইতেন। মাসে তাঁহার ৪/৫ হাজার টাকা আয়, তাঁহার পক্ষে এমন সামান্য বেশে থাকা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি একদিন কোন কার্য্যবশতঃ রাস্তার ধারে একজন সামান্য চর্ম্মকারের দোকানে বসিয়াছিলেন। একজন ভদ্রলোক গাড়ী করিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, বিদ্যাসাগর দোকানের সম্মুখে সামান্য আসনে বসিয়া আছেন। আর একদিন এই বড়লোকের সহিত বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ হয়। বড়লোক বলিলেন, "মহাশয় আপনার মত লোকের রাস্তার ধারে চর্ম্মকারের দোকানে বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, "ইহাতে যদি আপনার লজ্জা বোধ হয় আর আমার সহিত না মিশিলেই পারেন।"

একদিন বিদ্যাসাগর আম কিনিয়া রাস্তা দিয়া নিজের হাতে নিতেছিলেন, একজন বড়লোক সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। সে বিদ্যাসাগরকে দেখিলে পাছে বিদ্যাসাগর লজ্জা পান, তাই তিনি রাস্তার অপর পার্শ্ব দিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর সবই বুঝিলেন। তিনি দ্রুতপদে আম হস্তে সেই বড়লোকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একটুকু হাসিয়া বলিলেন, "আমার হাতে আমের বোঝা দেখিয়া বুঝি লজ্জা পাইয়াছ, আমার লজ্জা হয় নাই।"

বিদ্যাসাগরের চটি :

লাট ভবনেও তিনি চটি পায়ে দিয়া যাইতেন। ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন মহারাণীর ঘোষণাপত্র পাঠের জন্য সভা হয় তখন বিদ্যাসাগরের উপর ঘোষণাপত্রের বাঙলা অনুবাদ পাঠের ভার অর্পণ করা হয়। সভা আরম্ভ হইয়াছে। ছোটলাট পাত্র মিত্র সহ বসিয়া আছেন, বিদ্যাসাগর চটি জুতা পায়ে দিয়া দরবারে ঢুকিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বারবাণ তাঁহাকে হাঁকাইয়া দিল। বীটন সাহেব তখন বাঙালা গভর্ণমেন্টের প্রচার সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি দৌড়িয়া আসিয়া বিদ্যাসাগরকে যথা আদরের সহিত দরবারে লইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগরের ইংরাজ সংবাদ :

একদিন শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় ইংরেজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। পায়াদা যাইয়া তাঁহাদের আগমন বার্তা সাহেবকে জানায়। সাহেব মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সব শুয়ার লোক দিক ..."। বিদ্যাসাগরে সে কথা শুনিতে পাইলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলেন সাহেব হাস্যমুখে কত মিষ্ট কথা বলিয়া, তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য আসিতেছেন। ইংরেজদিগকে বিষকুম্ভপয়োমুখী কপটচারী বলিয়া আর কোন ইংরেজের সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেন না।

বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনের দু একটা কথা :

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার অবস্থা বড় হীন ছিল। তজ্জন্য তিনি পিতার সহিত নিজগ্রাম বীরসিংহ হইতে কলিকাতা প্রায় ২৪ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিতেন সঙ্গে কিছু চিঁড়ে কিম্বা অপর

কোন "জলপান" বাঁধিয়া আনিতেন। তাঁহার পঠদ্দশায় এক বেলা ভাত রাঁধিয়া দুই বেলা খাইতেন। তিনি বন্ধুদিগের নিকটে গল্প করিয়াছিলেন যে সপ্তাহে একদিন মাছ খাওয়া হইত। একই মাছের একদিন ঝোল রাঁধিয়া ঝোলটুকু আবার অন্যদিন সেই মাছের অম্বল রাঁধিয়া অম্বলটুকু খাইতেন। এইরূপ কয়েকদিন পরে উনি মাছটুকু খেতেন।

এ-দেশীয় রমণী :

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ছাত্রীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেই তিনি তাহাদিগকে পারিতোষিক দিতেন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত বহু বৎসর হইতে তাঁহার সম্বন্ধ রহিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রায় দু-এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কোন বন্ধুর পুত্রবধূকে বোর্ডিংয়ে রাখিবার বন্দোবস্ত করিবার উপলক্ষে একবার বেথুন বিদ্যালয়ে যান; তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভূষিত কুমারী চন্দ্রমুখী বসু প্রভৃতিকে দেখিয়া স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির কথা মনে করিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলেন, "আজ বেথুন সাহেব বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার কত আনন্দ হইত।" সেই বারে ছাত্রীগণকে মিষ্টান্ন ভোজনের জন্য তিনি কিছু টাকা দেন। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীগণ আবদার করায় তিনি তাহাদিগকেও টাকা দিয়া আসেন।

বাল্যবিবাহ :

তিনি আজীবন বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি এবং তাঁহার কয়েকজন বন্ধু "সর্ব্ব শুভকরী" নামক একটি সংবাদপত্র বাহির করেন। তাহাতে তিনি এইমত প্রকাশ করেন যে, বালিকাগণের চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। যেমন বিশ্বাস তেমনি কাজ। তিনি নিজ কন্যাগণের ১৫/১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ দেন নাই। বিশ্বাসানুসারে কর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া তিনি নিজপুত্র নারায়ণচন্দ্রের সহিত এক বিধবা বালিকার বিবাহ দেন।

শ্বশুর ও পুত্রবধূ :

আমাদের দেশে পুত্রবধূ কখনও শ্বশুরের সহিত কথা বলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গৃহে সে সঙ্কীর্ণ ভাব ছিল না। পুত্রবধূর সঙ্গেও সর্ব্বদা ঠাট্টা তামাশা করিতেন। কোন মহিলা আমাদিগকে লিখিয়াছেন :

আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাড়িতে যাইতাম। যখনই যাইতাম বেশিক্ষণ বিদ্যাসাগরের ঘরে বসিতাম। অনেক কথা হইত। তিনি আমাদিগগে ভালবাসিতেন। একদিন আমরা গিয়াছি, তাঁহার ঘরের মেঝেতে বসিয়া আছি, তাঁহার কন্যারাও বসিয়া আছেন। এমন সময়ে তাঁহার কন্যার এক ছেলে বাহ্যে করিল। সে কন্যাটি তাঁহার পুত্রকে লইয়া নীচে চলিয়া গেলেন, কিছু পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রবধূ সেই বাহ্যে পরিষ্কার করিতে আসিলেন। বিদ্যাসাগর বধূকে দেখিয়া সহাস্যমুখে অতি মধুর ভাবে স্নেহের সহিত বলিলেন, "ইটি কোথা হইতে আসিল। এ চাকরাণীটিকে কে পাঠাইল। একে তো আমি চিনিতে পারিতেছি না।" পরক্ষণেই আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ যার ছেলে যে কার্য্যটি করিল না, আর এক চাকরাণী

পাঠাইয়াছে।" পরক্ষণেই বধূকে বলিলেন, "ওগো তোমার মাহিনা কত!" বধূ তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই চারি টাকা।" কি সুন্দর দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব বাৎসল্য ভাব।

বাল্যলীলা :

আর একদিন আমরা ঐ প্রকার ঘরে বসিয়া আছি, আমার পুত্র তখন দুই বৎসরের। তাহাকে কোলে করিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া আছি। তিনি শিশুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভবিষ্যতে খুব বিদ্বান ও সচ্চরিত্র হইবে। ইহার যে একটা লক্ষণ আছে, যেরূপ লক্ষণ আমি অল্পই দেখিয়াছি। সে লক্ষণ খুব ভাল, এ যদি বাঁচে, আর তুই যদি তাকে ভাল করে পালন করিতে পারিস, তবে দেখবি, আমার কথা ঠিক হয় কিনা। কিন্তু আমাদের দেশে যে দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ইহার মধ্যে ভাল হওয়া মুস্কিল। তবে দেখিস ছেলে যাতে ভাল হয়।" আমি লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলাম না। আস্তে আস্তে বলিলাম, 'এযে দুষ্টু, একি কখন ভাল হয়।" অমনি তিনি বললেন, দেখ ছেলেবেলায় আমিও অমনি দুষ্টু ছিলাম, পাড়ার লোকের বাগানে যতরকম ফল চুপি চুপি খাইতাম। দেখ ছেলেবেলায় ওরকম কেহ কাপড় শুকাইতে দিয়াছে দেখিলে তাহার উপর বাহ্যে করিয়া আসিতাম, লোক আমার জ্বালায় অস্থির হইত। দেখ ছেলেবেলায় ও অমন দুষ্ট আছে, বড় হইলে ওসব কিছু থাকিবে না।

বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালা রচনা :

পূর্ব্বে বঙ্গ ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন হইতে বেশ আভাস পাওয়া যায়। সেকালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "পুরুষ পরীক্ষা" প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত কথাপূর্ণ পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ ছিল না। এই জন্য তৎকালিক শিক্ষাসমিতি ভাল বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচনা করিতে উপদেশ করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখেন। কিন্তু তাহা ভূতপূর্ব্ব ডাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "ভাল বাঙ্গালা নয় বলিয়া" অগ্রাহ্য করেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কি করেন, কোন বঙ্গভাষাবিদ্ ব্যক্তির অনুমোদনপত্র লাভের জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মার্শম্যান বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলীতে মার্শম্যান সাহেবের নিকট গেলেন। সাহেব তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনুমোদন করিলেন। সুতরাং তাঁহার পুস্তক পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইল।

বিদ্যাসাগরের পুস্তকালয় :

এমন পুস্তকালয় আর দেখা যায় না। যত দুর্ল্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, পুস্তকগুলি স্বর্ণ মণ্ডিত। একদিন কোন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরকে বলিলেন, "বই বান্ধনে খামকা এত টাকা কেন ব্যয় করেন?" ভদ্রলোকটির সোনার চেইন ঝুলিতেছিল। বিদ্যাসাগর বলিলেন, "আপনার সোনার চেইন কেন? একগাছা দড়ি হইলে ঘড়ী রাখা যাইতে পারে।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত উইল দ্বারা তিনি তাঁহার সুন্দর এবং বহুমূল্য পুস্তকালয়টি সাধারণের সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন।

তিনি না বুঝিয়া মুখস্ত করাতে বড় ঘৃণা করিতেন। এইজন্য মাঝে মাঝে বলিতেন যে শিক্ষাদান জন্য কলেজ করিলাম, তাহা প্রদত্ত হইতেছে না। কলেজ গৃহ চূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার ও কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের সহিত তিনি পান দোষ নিবারণের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আলয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। সম্মুখে গো দোহন হইতেছিল, তিনি তাহাই দেখিতেছিলেন। গাভীর বৎসরের প্রতি স্নেহ ও বৎসের মাতৃস্তন্য পানের জন্য ব্যাকুল ভাব দেখিয়া দয়ার সাগরের হৃদয় গলিয়া গেল। তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। সেই অবধি চতুর্দ্দশ বৎসর তিনি দুগ্ধ সম্বন্ধীয় কোন বস্তু স্পর্শ করেন নাই।